নিউক্লিয়ার ওয়ার

পৃথিবীর শেষের শুরু

নিউক্লিয়ার ওয়ার

পৃথিবীর শেষের শুরু

অ্যানি জ্যাকবসেন

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ১১
লেখিকার কথা ১৩
মুখবন্ধ ১৫

প্রথম পর্ব

প্রস্তুতি পর্ব অথবা আমরা কীভাবে এই অবস্থায় এসে পৌঁছালাম........ ২৪

প্রথম অধ্যায় **২৫**
ডিসেম্বর ১৯৬০, স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স... .... ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় **২৯**
ধ্বংসস্তূপের মাঝে এক কিশোরী ৬ আগস্ট, ১৯৪৫, হিরোশিমা, জাপান ২৯

তৃতীয় অধ্যায় **৩৪**
১৯৪৫-১৯৯০ লস আলামস, লরেন্স লিভারমোর... .... ৩৪
ইতিহাসের পাঠ নম্বর এক ডিটারেন্স বা প্রতিরোধ ৪৩

চতুর্থ অধ্যায় **৪৫**
দ্য সাইওপ ৪৫
পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত থাকুন ৫১

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম চব্বিশ মিনিট উৎক্ষেপণের শূন্য দশমিক চার সেকেন্ড পর পিয়ংজং... .... ৫৪
উৎক্ষেপণের এক থেকে তিন সেকেন্ড পর অ্যারোস্পেস ডেটা ফ্যাসিলিটি.......... ৫৬
চার সেকেন্ড মহাশূন্য.. ৫৮
পাঁচ সেকেন্ড অ্যারোস্পেস ডেটা ফ্যাসিলিটি, কলোরাডো.......................... ৫৯
ছয় সেকেন্ড ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন........................ ৬১
পনেরো সেকেন্ড বাকলি স্পেস ফোর্স বেস, কলোরাডো.......................... ৬৩
বিশ সেকেন্ড ক্লিয়ার স্পেস ফোর্স স্টেশন, আলাস্কা ৬৫
ত্রিশ সেকেন্ড শায়েন মাউন্টেন কমপ্লেক্স, কলোরাডো............................ ৬৭
ষাট সেকেন্ড ইউএস স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড সদর দপ্তর, নেব্রাস্কা ৭০
এক মিনিট, ত্রিশ সেকেন্ড NORAD সদর দপ্তর, পিটারসন স্পেস ফোর্স বেস ৭৩
দুই মিনিট ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন ৭৪
ইতিহাসের পাঠ নম্বর দুই ICBM আর্মাগেডন বা প্রলয়ংকরী ধ্বংসযজ্ঞ ৭৬
দুই মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড ইউএস স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড, নেব্রাস্কা...................... ৭৯
দুই মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন........ ৮১
ইতিহাসের পাঠ নম্বর তিন লঞ্চ অন ওয়ার্নিং ৮২
তিন মিনিট ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন....................... ৮৩
তিন মিনিট, পনেরো সেকেন্ড দ্য হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন ডিসি................ ৮৪
তিন মিনিট, ত্রিশ সেকেন্ড ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন ৮৬
চার মিনিট দ্য হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন ডিসি................................ ৮৮
ইতিহাসের পাঠ নম্বর চার ICBM লঞ্চ সিস্টেমস.................................. ৯১
চার মিনিট, ত্রিশ সেকেন্ড STRATCOM সদর দপ্তর, নেব্রাস্কা.................. ৯৪
পাঁচ মিনিট ইউএস মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সি সদর দপ্তর, ফোর্ট বেলভয়র.......... ৯৬
ছয় মিনিট কুরে অ্যাটলের উত্তরে, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর........................ ৯৮
সাত মিনিট ইউএস আর্মি স্পেস অ্যান্ড মিসাইল ডিফেন্স কমান্ড... ....১০১
৯ মিনিট ক্লিয়ার স্পেস ফোর্স স্টেশন, আলাস্কা ১০৪

৯ মিনিট, ১০ সেকেন্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্মি স্পেস অ্যান্ড মিসাইল... .... ১০৬
১০ মিনিট হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন ডিসি ১০৮
ইতিহাসের পাঠ নম্বর ৫ প্রেসিডেন্টের ফুটবল ১১২
১০ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন ডিসি ১১৫
১১ মিনিট পেন্টাগনের ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার ১১৭
১২ মিনিট STRATCOM হেডকোয়ার্টার্স, নেব্রাস্কা ১২১
১২ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড অ্যান্ডারসন এয়ার ফোর্স বেস, গুয়াম ১২৮
১৩ মিনিট মাউন্ট ওয়েদার, ভার্জিনিয়া ১৩০
১৪ মিনিট হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন ডিসি ১৩৪
১৫ মিনিট ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন ১৩৬
১৬ মিনিট ব্যাটল ডেক, STRATCOM হেডকোয়ার্টার্স, নেব্রাস্কা ১৩৭
১৭ মিনিট বিল এয়ার ফোর্স বেস, ক্যালিফোর্নিয়া ১৩৮
১৭ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন ডিসি ১৪০
১৮ মিনিট ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন ১৪১
ইতিহাসের পাঠ নম্বর ৬ পারমাণবিক অস্ত্রবাহী সাবমেরিন ১৪৫
১৯ মিনিট অ্যারোস্পেস ডেটা ফ্যাসিলিটি, কলোরাডো ১৫৫
২০ মিনিট ইউএস স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স, নেব্রাস্কা ১৫৬
২১ মিনিট ডায়াবলো ক্যানিয়ন পাওয়ার প্ল্যান্ট, সান লুইস ওবিস্পো কাউন্টি ১৫৮
২২ মিনিট ক্যাভালিয়ার স্পেস ফোর্স স্টেশন, নর্থ ডাকোটা ১৬৩
২৩ মিনিট হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন, ডিসি ১৬৪
২৩ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন ১৬৭
২৪ মিনিট মিসাইল অ্যালার্ট ফ্যাসিলিটি, ওয়াইমিং ১৬৮

তৃতীয় পর্ব

পরবর্তী ২৪ মিনিট ২৪ মিনিট র‍্যাঞ্চো সান মিগুয়েলিটো, পয়েন্ট বুকন... .... ১৭৩
২৫ মিনিট ডেটা সেন্টার, স্যাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া ১৭৬

২৫ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড ডায়াবলো ক্যানিয়ন, ক্যালিফোর্নিয়া ১৭৭
২৬ মিনিট জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, মস্কো, রাশিয়া ১৮২
২৭ মিনিট মহাকাশে ১৮৪
২৮ মিনিট মেরিন ওয়ান, মেরিল্যান্ডের বেথেসদার আকাশে..................... ১৮৬
৩১ মিনিট ন্যাশনাল মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, পেন্টাগন..................... ১৯১
৩২ মিনিট অস-প্রে-তে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং ভাইস-চেয়ারম্যান ১৯২
৩২ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড ওসান এয়ার বেস, রিপাবলিক অফ কোরিয়া..................... ১৯৪
৩২ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড মেরিন ওয়ান, আকাশে ১৯৬
৩৩ মিনিট গ্রাউন্ড জিরো, পেন্টাগন..................... ১৯৮
৩৩ মিনিট সেরপুখভ-১৫, কালুগা ওব্লাস্ট..................... ২০০
৩৪ মিনিট হাডসন ইয়ার্ডস, নিউইয়র্ক সিটি ২০৩
৩৫ মিনিট ডায়াবলো ক্যানিয়ন, ক্যালিফোর্নিয়া ২০৫
ইতিহাসের পাঠ নম্বর ৭ প্রাউড প্রফেট ওয়ার গেম ২০৭
৩৬ মিনিট ইউএস স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স, নেব্রাস্কা..................... ২১২
৩৭ মিনিট অজানা কোনো এক জায়গা, প্রশান্ত মহাসাগর..................... ২১৫
৩৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ড জয়েন্ট অপারেশনস ইন্টেলিজেন্স সেন্টার... .... ২১৯
৩৮ মিনিট গ্রাউন্ড জিরো, রিং ওয়ান আর রিং টু ২২০
৩৮ মিনিট রেভেন রক মাউন্টেন কমপ্লেক্স, পেনসিলভেনিয়া..................... ২২৪
৩৯ মিনিট ন্যাটো হেডকোয়ার্টার্স, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম..................... ২২৭
৩৯ মিনিট ন্যাশনাল ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, মস্কো, রাশিয়া ২২৯
৪০ মিনিট শাইয়েন মাউন্টেন কমপ্লেক্স, কলোরাডো..................... ২৩১
৪০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড হোজুং-নি আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটি... .... ২৩৫
৪০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড ন্যাশনাল ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, মস্কো..................... ২৩৬
৪০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড হাডসন ইয়ার্ডস, নিউইয়র্ক সিটি..................... ২৩৭
৪০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড লস ওসোস, ক্যালিফোর্নিয়া..................... ২৪১
৪০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড অজানা কোনো এক জায়গা,... .... ২৪৪
৪১ মিনিট সেন্ট্রাল কমান্ড সেন্টার, কমসোমলস্ক-অন-আমুর, রাশিয়া ২৪৬

৪১ মিনিট ১ সেকেন্ড ডুমসডে প্লেনের ভেতর, নর্থ ডাকোটা... ২৪৮
৪২ মিনিট বয়েডস, মেরিল্যান্ড ২৫১
৪২ মিনিট গ্রাউন্ড জিরো, ন্যাশনাল জু ২৫২
ইতিহাসের পাঠ নম্বর ৮ রেডিয়েশন সিকনেস বা বিকিরণজনিত অসুস্থতা ২৫৩
উৎক্ষেপণের ৪৩ মিনিট পর আন্ডারগ্রাউন্ড বাংকার, সাইবেরিয়া, রাশিয়া ২৫৭
৪৫ মিনিট ডমবারোভস্কি, রাশিয়া ২৬৭
৪৫ মিনিট ১ সেকেন্ড অ্যারোস্পেস ডেটা ফেসিলিটি, কলোরাডো ২৭১

চতুর্থ পর্ব

পরবর্তী এবং একেবারে শেষ ২৪ মিনিট ২৭৩
৪৮ মিনিট শায়েন মাউন্টেন কমপ্লেক্স, কলোরাডো ২৭৩
৪৮ মিনিট ১০ সেকেন্ড ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কাছে... ২৭৪
৪৯ মিনিট রেভেন রক মাউন্টেন কমপ্লেক্স, পেনসিলভানিয়া ২৭৭
৪৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড ডুমসডে প্লেনের ভেতর, ইউটার আকাশে ২৭৮
৪৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড রেভেন রক মাউন্টেন কমপ্লেক্স, পেনসিলভানিয়া ২৮০
৫০ মিনিট ডুমসডে প্লেনের ভেতর, ইউটার আকাশে ২৮২
৫১ মিনিট ন্যাটোর বিমানঘাঁটি, ইউরোপ ২৮৪
৫২ মিনিট পিয়ংইয়ং, উত্তর কোরিয়া ২৮৬
৫২ মিনিট মাউন্ট পেকতু, উত্তর কোরিয়া ২৯৩
৫২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড রেডস্টোন আর্সেনাল, হান্টসভিলে, আলাবামা ২৯৬
৫৩ মিনিট ওসান এয়ার বেস, রিপাবলিক অফ কোরিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়া ৩০১
৫৪ মিনিট বয়েডস, মেরিল্যান্ড ৩০৪
৫৫ মিনিট রেডস্টোন আর্সেনাল, হান্টসভিলে, আলাবামা ৩০৫
৫৫ মিনিট, ১০ সেকেন্ড দ্য ডুমসডে সিনারিও, মানে পৃথিবীর শেষ দিন ৩০৬
হিস্ট্রি লেসন নাম্বার নাইন ট্রেডমিলে দৌড়ানো বানরের দল ৩১১

৫৭ মিনিট কেয়ামতের ধ্বংসদূতের আগমন ৩১৩
৫৮ মিনিট আভিয়ানো এয়ার বেস, ইতালি ৩১৬
৫৯ মিনিট আটলান্টিক মহাসাগর ৩১৭
৭২ মিনিট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩১৯

পঞ্চম পর্ব

আগামী চব্বিশ মাস এবং তারও পর অথবা, একটি পারমাণবিক যুদ্ধ... .... ৩২২
২৪ হাজার বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৩২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৩৪২

প্রকাশকের কথা

মানবসভ্যতার ইতিহাস যদি আমরা গভীরভাবে দেখি, তবে দেখতে পাই—এটি কেবল অগ্রগতির ইতিহাস নয়; বরং এটি একইসাথে ভয়, ক্ষমতা ও ধ্বংসের সম্ভাবনায় ঘেরা এক দীর্ঘ যাত্রা। যুদ্ধ সেই যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এই বইটি আমাদের সামনে যে বাস্তবতা তুলে ধরে, তা যুদ্ধের প্রচলিত ধারণাকেও অতিক্রম করে—এটি এমন এক যুদ্ধের কথা, যার শুরু মানেই শেষের সূচনা।

'নিউক্লিয়ার ওয়ার: পৃথিবীর শেষের শুরু'—কোনো গতানুগতিক বই নয়, বরং এটি এক নির্মম আয়না, যেখানে আমরা আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে ভয়ংকর সম্ভাব্য পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করি। এই গ্রন্থে লেখিকা অসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন পারমাণবিক যুদ্ধের সেই মুহূর্তগুলো, যা কেবল কল্পনা নয়—বরং বহু দশক ধরে প্রস্তুত করা বাস্তব পরিকল্পনার ফলাফল। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী ও সামরিক কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার এবং ডিক্লাসিফাইড নথির ভিত্তিতে নির্মিত এই বিবরণ আমাদের চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়।

এই প্রসঙ্গে লেখিকা অ্যানি জ্যাকবসেন সম্পর্কে কিছু বলা জরুরি। সমকালীন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও নন-ফিকশন রচনায় তিনি এক অনন্য নাম। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গোপন কর্মসূচি, গোয়েন্দা সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাঠামোর অন্তরালের জগৎ তিনি দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান করেছেন। তার লেখার বৈশিষ্ট্য হলো—গভীর গবেষণা, প্রামাণ্য সাক্ষাৎকার এবং জটিল বাস্তবতাকে বর্ণনামূলক শক্তিতে জীবন্ত করে তোলা। এই বইতেও তিনি সেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—যেখানে তথ্য কেবল তথ্য হয়ে থাকে না, বরং তা এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় রূপ নেয়।

এই গ্রন্থটি বাংলায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাধারণত অনুবাদের ক্ষেত্রে 'মূলানুগ' ধারা অনুসরণ করা হয়—অর্থাৎ বাক্যগঠন ও ভাষাকে যতটা সম্ভব হুবহু ধরে রাখা। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, এই বইয়ের

আবেগ, তীব্রতা ও গতিশীলতা কেবল শব্দের অনুবাদে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। তাই আমরা এখানে 'ভাবানুবাদ'-এর পথ অনুসরণ করেছি। এর অর্থ হলো—মূল বক্তব্য, তথ্য ও ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে ভাষাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে, যাতে বাংলা পাঠকের কাছে তা স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। কোথাও কোথাও বাক্যগঠন, বর্ণনার ভঙ্গি কিংবা উপস্থাপনার ধরনে পরিবর্তন আনা হয়েছে—শুধুমাত্র পাঠ-অভিজ্ঞতাকে আরও গভীর ও সাবলীল করার জন্য। এই কারণেই, এই বইটিকে কেবল 'অনুবাদ' বলা যথেষ্ট নয়; বরং একে বলা যেতে পারে—মূল গ্রন্থের অবলম্বনে রচিত বাংলা সংস্করণ। এখানে আমরা মূল বইয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও ভাষা ও অনুভূতির দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র পাঠ-অভিজ্ঞতা নির্মাণের চেষ্টা করেছি।

একজন প্রকাশক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কেবল ভালো বই পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া নয়; বরং এমন বইও সামনে আনা, যা আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে, প্রশ্ন করতে শেখায় এবং সতর্ক করে। এই গ্রন্থটি ঠিক তেমনই একটি কাজ করেছে। এটি পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলবে, ভীত করবে, কিন্তু একই সাথে তাকে ভাবতে বাধ্য করবে—আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং কোন পথে এগোচ্ছি।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এই বইটি উপস্থাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা বিশ্বাস করি, এই সংস্করণ শুধু তথ্যের পরিবেশন নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ বোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা—যেন আমরা বুঝতে পারি, প্রযুক্তির অগ্রগতি যদি নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে তা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ নয়, বরং অভিশাপ হয়ে উঠতে পারে। শেষ পর্যন্ত, এই বইটি একটি সতর্কবার্তা—নীরব কিন্তু তীব্র। আমরা আশা করি, পাঠক এই বই থেকে কেবল ভয়ই নয়, বরং বোধ, সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধও অর্জন করবেন।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০৬-৪-২০২৬

লেখিকার কথা

১৯৫০ সালের শুরুর দিককার কথা। সেই সময় থেকে মার্কিন সরকার পারমাণবিক যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেলেছে। একই সাথে তারা এমন কিছু প্রোটোকল বা নিয়মকানুন তৈরি করেছে, যেন এক মহাপ্রলয়ংকারী পারমাণবিক বিপর্যয়ে কোটি কোটি আমেরিকান মারা যাওয়ার পরও মার্কিন সরকার ঠিকঠাক কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

একটি পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ধেয়ে আসার ঠিক পরের মুহূর্তগুলো কেমন হতে পারে, এই বইয়ে সেই দৃশ্যপটটিই তুলে ধরা হয়েছে। এটি একেবারেই সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। প্রেসিডেন্সিয়াল উপদেষ্টা, মন্ত্রিসভার সদস্য, পারমাণবিক অস্ত্র প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, সৈন্য, বৈমানিক, স্পেশাল অপারেটর, সিক্রেট সার্ভিস, জরুরি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, গোয়েন্দা বিশ্লেষক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে এক্সক্লুসিভ সব সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে এই বইয়ের তথ্যগুলো সাজানো হয়েছে। এই মানুষগুলো দশকের পর দশক ধরে এই ভয়ংকর দৃশ্যপটগুলো নিয়ে কাজ করে আসছেন।

সাধারণ পারমাণবিক যুদ্ধের পরিকল্পনাগুলো হলো, মার্কিন সরকারের কাছে রাখা সবচেয়ে গোপনীয় বিষয়গুলোর একটি। এই বইটি এবং এর ভেতরে থাকা দৃশ্যপট পাঠককে ঠিক ততটুকু জানার সুযোগ করে দেবে, যতটুকু আইনত জানা সম্ভব। কয়েক দশক ধরে আড়ালে রাখা ডিক্লাসিফাইড বা উন্মুক্ত করা নথিপত্রগুলো এখানে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যা এক ভয়ংকর স্পষ্টতায় পুরো ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো পেন্টাগন। এই বইয়ের দৃশ্যপটে দেখা যাবে, ওয়াশিংটন ডিসি প্রথম আক্রমণের শিকার হচ্ছে। আঘাত হানছে একটি ১ মেগাটন থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা।

সাবেক সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব অ্যান্ড্রু ওয়েবার বলেছেন, ‘ওয়াশিংটন ডিসির সবাই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় এই বোল্ট আউট অফ দ্য ব্লু আক্রমণকে।’

মার্কিন নিউক্লিয়ার কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল কোনো ধরনের পূর্ব সতর্কবার্তা ছাড়া বিশাল পারমাণবিক আক্রমণ বোঝাতে এই বোল্ট আউট অফ দ্য ব্লু শব্দটি ব্যবহার করে।

ডিসির ওপর এই আঘাত মূলত আর্মাগেডন বা এক মহাপ্রলয়ংকারী সাধারণ পারমাণবিক যুদ্ধের সূচনা করে। এই আঘাতের পর সেই প্রলয় যে নিশ্চিতভাবে ঘটবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ওয়াশিংটনে একটি কথা খুব শোনা যায়। বলা হয়ে থাকে, ‘ছোট পারমাণবিক যুদ্ধ বলে আসলে কিছু নেই।’

পেন্টাগনে একটি পারমাণবিক হামলা হলো এমন এক দৃশ্যপটের শুরু, যার শেষ পরিণতি হবে আমাদের পরিচিত সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস। আমরা সবাই যে পৃথিবীতে বাস করছি, এটাই তার চরম বাস্তবতা। এই বইয়ে প্রস্তাবিত পারমাণবিক যুদ্ধের দৃশ্যপট কালই ঘটতে পারে। কিংবা আজ দিনের শেষেও ঘটতে পারে।

ইউনাইটেড স্টেটস স্ট্র্যাটেজিক কমান্ডের সাবেক কমান্ডার জেনারেল রবার্ট কেলার এক ভয়ংকর সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবীর অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে।’

‘মানবজাতির গল্পটাই হলো যুদ্ধের গল্প। সংক্ষিপ্ত এবং অনিশ্চিত কিছু বিরতি বাদ দিলে, এই পৃথিবীতে কখনোই শান্তি ছিল না। আর ইতিহাসের সূচনা হওয়ার আগে থেকেই, সর্বজনীন এবং অবিরাম এক রক্তক্ষয়ী সংঘাত লেগেই ছিল।’

—উইনস্টন চার্চিল।

মুখবন্ধ

পৃথিবীতে নেমে আসা নরক

ওয়াশিংটন ডিসি, অদূর ভবিষ্যতের কোনো এক সম্ভাব্য সময়।

একটি ১ মেগাটন থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রের বিস্ফোরণ শুরু হয় প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি আর ভয়াবহ তাপ দিয়ে। এই তাপ আর আলোর তীব্রতা এতই বেশি যে মানুষের মস্তিষ্কের পক্ষে সেটা কল্পনা করাও অসম্ভব। আঠারো কোটি ডিগ্রি ফারেনহাইট! ভাবা যায়? পৃথিবীর যে সূর্য, তার ঠিক কেন্দ্রের তাপমাত্রার চেয়েও এই তাপ চার থেকে পাঁচ গুণ বেশি।

ওয়াশিংটন ডিসির উপকণ্ঠে পেন্টাগনের বুকে এই থার্মোনিউক্লিয়ার বোমাটি আঘাত হানার পর এক মিলিসেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ঝলসে ওঠে এক তীব্র আলো। খুব ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সফট এক্সরে আলো। এই আলো চারপাশের বাতাসকে মুহূর্তের মাঝে কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রায় নিয়ে যায়। জন্ম নেয় এক বিশাল অগ্নিগোলক, যা ঘণ্টায় লাখ লাখ মাইল বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর এই অগ্নিগোলকের ব্যাস এক মাইলেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৫৭০০ ফুটে গিয়ে দাঁড়ায়। এর আলো আর তাপ এতই তীব্র যে কংক্রিটের দেয়ালগুলো স্রেফ বিস্ফোরিত হয়। ধাতব বস্তুগুলো গলে বাষ্প হয়ে যায়। পাথর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। আর মানুষ? চোখের পলকে তারা পরিণত হয় জ্বলন্ত কার্বনে।

পেন্টাগনের সেই বিখ্যাত পাঁচ তলা, পঞ্চভুজ আকৃতির ভবনটির কথা ধরা যাক। এর ৬৫ লাখ বর্গফুট অফিস স্পেসের ভেতরে থাকা সবকিছু ওই প্রাথমিক আলো আর তাপের ঝলকানিতেই অতিউত্তপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হয়। এর প্রায় সাথে সাথেই সেখানে এসে আঘাত হানে প্রবল এক শকওয়েভ। মুহূর্তের মাঝে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় সব দেয়াল, আর চোখের পলকে মারা যায় সেখানে কর্মরত সাতাশ হাজার মানুষ।

ওই অগ্নিগোলকের ভেতরে কোনো কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকে না। কিচ্ছু না।

গ্রাউন্ড জিরোর অস্তিত্ব বলতে স্রেফ শূন্য ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না।

অগ্নিগোলক থেকে ঠিকরে বের হওয়া বিকীর্ণ তাপ আলোর বেগে ছুটতে থাকে। চারপাশের কয়েক মাইল জুড়ে এর দৃষ্টিসীমায় দাহ্য যা কিছু পড়ে, তার সবকিছুতেই আগুন ধরে যায়। ঘরের পর্দা, কাগজ, বইপত্র, কাঠের বেড়া, মানুষের গায়ের পোশাক, শুকনো পাতা সব দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। এগুলো যেন এক বিশাল ফায়ারস্টর্ম বা অগ্নিঝড়ের জ্বালানি হিসেবে কাজ করে। এই অগ্নিঝড় একশো বর্গমাইল বা তার চেয়েও বড় একটা এলাকাকে গ্রাস করে নিতে শুরু করে। অথচ এই আলোর ঝলকানির একটু আগেও এই জায়গাটা ছিল আমেরিকান প্রশাসনের স্পন্দিত হৃদয়, যেখানে প্রায় ৬০ লাখ মানুষের বসবাস ছিল।

পেন্টাগন থেকে কয়েকশো ফুট উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে ৬৩৯ একর আয়তনের আর্লিংটন ন্যাশনাল সিমেট্রি। যুদ্ধে নিহতদের সম্মানে সেখানে রয়েছে চার লাখ মানুষের হাড়গোড় আর সমাধিপাথর। ২৭ নম্বর সেকশনে কবর দেওয়া আছে ৩৮০০ আফ্রিকান আমেরিকান মুক্তদাস। এই বসন্তের পড়ন্ত বিকেলে যারা সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন, সেই দর্শনার্থীরা, লন পরিষ্কার করা মালিরা, গাছের পরিচর্যা করা কর্মীরা, ট্যুর গাইডরা, এমনকি টোম্ব অফ দ্য আননোনস বা অজানা সেনাদের সমাধির পাহারায় থাকা সাদা গ্লাভস পরা ওল্ড গার্ডের সদস্যরাও চোখের নিমিষে পরিণত হন অঙ্গার হয়ে যাওয়া জ্বলন্ত মানবমূর্তিতে। তারা সবাই কালো জৈব পদার্থের গুঁড়োয় রূপ নেন, যাকে আমরা সোজা বাংলায় বলি ভুসোকালি। যারা এভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যান, তারা অন্তত এক দিক দিয়ে বেঁচে যান। কারণ এই প্রথম 'বোল্ট আউট অফ দ্য ব্লু' পারমাণবিক হামলায় তখনও যে ১০ থেকে ২০ লাখ মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হয়েও বেঁচে আছেন, তাদের ওপর যে অভূতপূর্ব বীভৎসতা নেমে আসতে চলেছে, সেই নরকযন্ত্রণা আর তাদের সইতে হয় না।

সেখান থেকে এক মাইল উত্তর-পূর্বে পোটোম্যাক নদীর ওপারে লিঙ্কন এবং জেফারসন মেমোরিয়ালের মার্বেল পাথরের দেয়াল আর স্তম্ভগুলো প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফাটল ধরে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ধুলোয় মিশে যায়। এই ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে চারপাশের এলাকার সাথে যুক্ত করা ইস্পাত আর পাথরের সেতু এবং হাইওয়েগুলো হুড়মুড় করে ধসে পড়ে। ইন্টারস্টেট ৩৯৫ পেরিয়ে আরও দক্ষিণের দিকে গেলে চোখে পড়বে পেন্টাগন সিটির ফ্যাশন সেন্টার। এর

বিশাল, আলো ঝলমলে কাঁচের দেয়াল ঘেরা শপিং মলে ছিল নামিদামি সব ব্র্যান্ডের পোশাক আর ঘরের জিনিসের দোকানপাট। এর চারপাশের রেস্তোরাঁ, অফিস, আর ঠিক পাশেই থাকা পেন্টাগন সিটির রিৎজ কার্লটন হোটেল সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ছাদের কড়িকাঠ, কাঠের তক্তা, চলন্ত সিঁড়ি, ঝাড়বাতি, কার্পেট, আসবাবপত্র, ম্যানিকুইন, কুকুর, কাঠবিড়ালি, মানুষ মুহূর্তের মধ্যে আগুনে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। সময়টা মার্চের শেষভাগ। স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা বেজে ৩৬ মিনিট।

প্রথম বিস্ফোরণের পর ঠিক তিন সেকেন্ড পার হয়েছে।

ঠিক আড়াই মাইল পশ্চিমে ন্যাশনালস পার্কে তখন একটা বেসবল খেলা চলছিল। খেলা দেখতে আসা ৩৫ হাজার মানুষের বেশিরভাগের গায়ের পোশাকে আগুন ধরে যায়।

যারা খুব দ্রুত পুড়ে মারা যাবেন না, তারা থার্ড ডিগ্রি বার্নের মতো ভয়াবহ যন্ত্রণায় ভুগবেন। তাদের শরীরের চামড়ার বাইরের স্তর পুরো খসে পড়বে আর ভেতরের রক্তাক্ত মাংসপেশি বেরিয়ে আসবে। থার্ড ডিগ্রি বার্নে আক্রান্তদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে তাৎক্ষণিক বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় অঙ্গ কেটে বাদ দিতে হয়।

ন্যাশনালস পার্কের ভেতরে হয়তো কয়েক হাজার মানুষ প্রথমে কোনোভাবে বেঁচে যেতে পারেন। তারা হয়তো খাবার কিনতে বা বাথরুম ব্যবহার করতে ভেতরে ছিলেন। এই মানুষগুলোর এখন বার্ন সেন্টারে একটা বিছানা খুব দরকার। কিন্তু পুরো ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটান এলাকায় বিশেষায়িত বার্ন বেড আছে মাত্র দশটি। সেগুলো সেন্ট্রাল ডিসির মেডস্টার ওয়াশিংটন হাসপাতালের বার্ন সেন্টারে। আর যেহেতু এই হাসপাতালটি পেন্টাগনের প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে, তাই এটি আর কাজ করছে না। হয়তো এর কোনো অস্তিত্বই আর নেই।

পঁয়তাল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্বে বাল্টিমোরের জনস হপকিন্স বার্ন সেন্টারে কুড়িটিরও কম বিশেষায়িত বার্ন বেড আছে, তবে সেগুলো খুব শিগগিরই রোগীতে ভরে যাবে। সব মিলিয়ে আমেরিকার পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্য মিলিয়ে যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ে মাত্র দুই হাজারটির মতো বিশেষায়িত বার্ন ইউনিটের বেড থাকে।

পেন্টাগনে এই ১ মেগাটন পারমাণবিক বোমা হামলার পর, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাপীয় বিকিরণের কারণে আরও প্রায় দশ লাখ মানুষের ত্বক গভীরভাবে পুড়ে যাবে।

আর এদের মধ্যে নব্বই শতাংশ মানুষই মারা যাবেন।

প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী আর শিক্ষাবিদরা মিলে দশকের পর দশক ধরে এই হিসাবগুলো করেছেন। বোমাটি যখন ফাটবে, তখন বেশিরভাগ মানুষ যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, সেখান থেকে কয়েক কদমের বেশি এগোতে পারবেন না। ১৯৫০-এর দশকে যখন এই ভয়াবহ হিসাবগুলো প্রথম করা হয়েছিল, তখন সিভিল ডিফেন্স বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা এদের নাম দিয়েছিলেন 'ডেড হোয়েন ফাউন্ড' বা 'খুঁজে পাওয়ার সময়ই মৃত'।

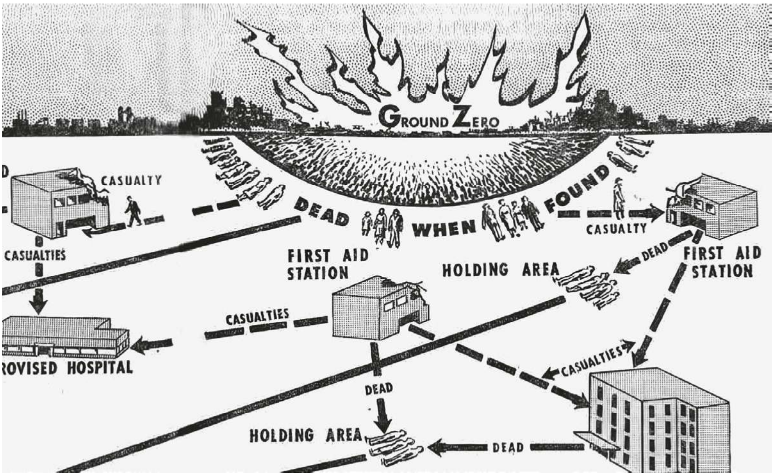

'ডেড হোয়েন ফাউন্ড।'(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সিভিল ডিফেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)

পোটোম্যাক নদীর ওপারে দক্ষিণ-পূর্বে এক হাজার একরের সামরিক স্থাপনা জয়েন্ট বেস অ্যানাকোস্টিয়া বোলিংয়ে আরও সতেরো হাজার মানুষ প্রাণ হারাবেন। এদের মধ্যে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সদর দপ্তর, হোয়াইট হাউস কমিউনিকেশনস এজেন্সির সদর দপ্তর, মার্কিন কোস্টগার্ড স্টেশন ওয়াশিংটন, মেরিন ওয়ান হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গার এবং দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরও বহু কড়া পাহারার ফেডারেল স্থাপনায় কর্মরত প্রায় সবাই মারা যাবেন।

ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসা চার হাজার শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই মারা যাবেন বা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়বেন। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পেন্টাগনের অর্থে পরিচালিত এবং আমেরিকার দ্বিশতবর্ষ পূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানেই সামরিক কর্মকর্তারা শিখতে আসেন, কীভাবে মার্কিন সামরিক কৌশল ব্যবহার করে সারা বিশ্বে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার আধিপত্য বজায় রাখা যায়।

এই পারমাণবিক হামলায় শুধু যে ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি ধ্বংস হবে, তা কিন্তু নয়। সামরিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা যায়, এমন আরও অনেক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আইজেনহাওয়ার স্কুল ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যান্ড রিসোর্স স্ট্র্যাটেজি, ন্যাশনাল ওয়ার কলেজ, ইন্টার-আমেরিকান ডিফেন্স কলেজ, আফ্রিকা সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এসবের কোনো কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না।

বজার্ড পয়েন্ট পার্ক থেকে শুরু করে সেন্ট অগাস্টিনস এপিস্কোপাল চার্চ পর্যন্ত, আর নেভি ইয়ার্ড থেকে ফ্রেডরিক ডগলাস মেমোরিয়াল ব্রিজ পর্যন্ত নদীর ধারের পুরো এলাকাটা সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছিল পৃথিবীকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে। আর এখন, একবিংশ শতাব্দীতে এসে সেই পারমাণবিক অস্ত্রই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চলেছে। সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চলেছে।

বোমা তৈরির পেছনের বিজ্ঞানটা কিন্তু বেশ গভীর। থার্মোনিউক্লিয়ার আলোর ঝলকানিতে পরপর দুটো থার্মাল রেডিয়েশন বা তাপীয় বিকিরণ হয়। প্রথম বিকিরণটা এক সেকেন্ডের খুব সামান্য একটা ভগ্নাংশ সময় জুড়ে স্থায়ী হয়। এরপর আসে দ্বিতীয় বিকিরণ, যা কয়েক সেকেন্ড ধরে চলতে থাকে। এই দ্বিতীয় বিকিরণটাই মানুষের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় আর পুড়িয়ে মারে। এই আলোর বিকিরণগুলো একদম শব্দহীন। কারণ আলোর তো আর কোনো শব্দ নেই।

কিন্তু এর পরেই আসে প্রচণ্ড এক গর্জনের শব্দ। এটাই হলো সেই ভয়ংকর বিস্ফোরণ বা ব্লাস্ট। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড তাপ তৈরি হয়, তা থেকে একটা হাই-প্রেশার ওয়েভ বা উচ্চচাপের ঢেউ জন্ম নেয়। এটা ঠিক সুনামির মতো কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এটা হলো প্রচন্ড চাপে থাকা বাতাসের একটা বিশাল দেয়াল, যা শব্দের চেয়েও দ্রুত বেগে ধেয়ে আসে। এই হাওয়া মানুষকে

মাটিতে আছড়ে ফেলে, শূন্যে ছুড়ে মারে, ফুসফুস আর কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়। এমনকি মানুষের শরীর শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলতে পারে।

অ্যাটমিক আর্কাইভের জন্য এই ভয়ংকর পরিসংখ্যানগুলো যিনি তৈরি করেন, সেই আর্কাইভার বলেন, ‘সাধারণত বাতাসের চাপের পরিবর্তনে বড় বড় দালানকোঠা ধ্বংস হয়ে যায়। আর মানুষ, গাছপালা কিংবা বিদ্যুতের খুঁটির মতো জিনিসগুলো বাতাসের তোড়ে উড়ে যায়।’

পারমাণবিক অগ্নিগোলকটা যত বড় হতে থাকে, এই শকওয়েভ বা ধাক্কাটা তত বেশি ধ্বংসলীলা চালাতে থাকে। এটা যেন একটা বুলডোজারের মতো সব কিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে আরও তিন মাইল সামনে এগিয়ে যায়। বিস্ফোরণের ঢেউয়ের পেছনের বাতাস আরও দ্রুত ছুটতে থাকে। তখন বাতাসের বেগ ঘণ্টায় কয়েকশো মাইল হয়ে যায়। এই গতি এতই প্রবল যে, তা কল্পনা করাও কঠিন।

২০১২ সালে স্যান্ডি নামের যে ঘূর্ণিঝড়টা ৭০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করেছিল আর প্রায় ১৪৭ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, তার সর্বোচ্চ বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র ৮০ মাইলের মতো। আর পৃথিবীতে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বাতাসের বেগ মাপা হয়েছে ঘণ্টায় ২৫৩ মাইল। এটা মাপা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার এক দুর্গম আবহাওয়া কেন্দ্রে।

ওয়াশিংটন ডিসির এই পারমাণবিক বিস্ফোরণের ধাক্কা এর সামনে পড়া সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। অফিস, অ্যাপার্টমেন্ট, স্মৃতিস্তম্ভ, জাদুঘর, পার্কিং লট চোখের পলকে সবকিছুর আকার বদলে গিয়ে তা ধুলোয় মিশে যাবে। যা বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভাঙবে না, তা বাতাসের প্রবল তোড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বড় বড় বিল্ডিং ধসে পড়বে, ব্রিজ ভেঙে পড়বে, ক্রেন উল্টে যাবে। কম্পিউটার আর সিমেন্টের ব্লকের মতো ছোট জিনিস থেকে শুরু করে ১৮ চাকার বিশাল ট্রাক আর দোতলা ট্যুর বাসগুলোও টেনিস বলের মতো বাতাসে উড়তে থাকবে।

প্রথম ১.১ মাইল ব্যাসার্ধের ভেতর যা কিছু ছিল, তার সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার পর পারমাণবিক সেই বিশাল অগ্নিগোলকটি এবার হট এয়ার বেলুনের মতো ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে। সেকেন্ডে ২৫০ থেকে ৩৫০ ফুট বেগে এটা মাটি থেকে আকাশের দিকে ভাসতে থাকে।

পার হয়ে যায় ৩৫ সেকেন্ড।

ততক্ষণে সেই কুখ্যাত মাশরুম ক্লাউড বা ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘ তৈরি হতে শুরু করেছে। এই মেঘের বিশাল মাথা আর ডাঁটাটা তৈরি হয়েছে আসলে পুড়ে যাওয়া মানুষ আর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দিয়ে। এর রঙ লাল থেকে বাদামি, আর তারপর কমলা রঙের হয়ে ওঠে। এরপরেই শুরু হয় এক ভয়ংকর উল্টো টান বা রিভার্স সাকশন। গাড়ি, মানুষ, বিদ্যুতের খুঁটি, রাস্তার সাইনবোর্ড, পার্কিং মিটার, এমনকি ইস্পাতের ভারি বিম সবকিছু যেন এক অদৃশ্য টানে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে পড়ে এবং আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

পার হয়ে যায় ৬০ সেকেন্ড।

মাশরুম ক্লাউডের সেই মাথা আর ডাঁটা, যা এখন দেখতে অনেকটা ধূসর-সাদা রঙের, গ্রাউন্ড জিরো থেকে পাঁচ মাইল, তারপর দশ মাইল ওপরে উঠে যায়। মেঘের মাথাটাও বড় হতে থাকে। এটা দশ, বিশ, ত্রিশ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, চারদিকে ফুলেফেঁপে ওঠে। একপর্যায়ে এটা ট্রপোমন্ডল বা ট্রপোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে যায়। বাণিজ্যিক বিমানগুলো যে উচ্চতায় ওড়ে, তার চেয়েও উঁচুতে। পৃথিবীর আবহাওয়া যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই স্তরও পেরিয়ে যায়।

এরপর শুরু হয় আরেক বিভীষিকা। তেজস্ক্রিয় কণাগুলো ফলআউট বা পারমাণবিক ছাই হয়ে নিচে থাকা সবকিছুর ওপর বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে। মাটি আর মানুষের ওপর নেমে আসে এক অভিশাপ। কয়েক দশক আগেই পদার্থবিজ্ঞানী কার্ল সেগান এই ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'পারমাণবিক বোমা থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের এক ভয়ংকর মিশ্রণ তৈরি হয়, যা মেঘের সাথে মিশে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।'

বিস্ফোরণের পর পার হয়ে গেছে প্রায় দুই মিনিট। আর দশ লাখেরও বেশি মানুষ ততক্ষণে মারা গেছেন, কিংবা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

এবার শুরু হয় অগ্নিকাণ্ড। এটা কিন্তু আগের সেই অগ্নিগোলকের মতো নয়। এটা হলো, এক অভাবনীয় মাপের মেগা ফায়ার। গ্যাসের লাইনগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকে। মনে হয় যেন বিশাল বড় বড় সব ব্লোটর্চ বা ফ্লেমথ্রোয়ার আগুন উগরে দিচ্ছে। দাহ্য পদার্থে ভরা ট্যাঙ্কগুলো ফেটে যায়। রাসায়নিক কারখানাগুলোও বিস্ফোরিত হতে থাকে।

ওয়াটার হিটার আর ফার্নেসের পাইলট লাইটগুলো যেন মশাল জ্বালানোর কাজ করে, যা কিছু পুড়তে বাকি ছিল তাতেও আগুন ধরিয়ে দেয়। ধসে পড়া দালানগুলো বিশাল

ওভেনের মতো কাজ করতে শুরু করে। চারদিকে মানুষ জ্যান্ত পুড়তে থাকে। মেঝের আর ছাদের ফাঁকা জায়গাগুলো যেন বিশাল বিশাল চিমনি হয়ে ওঠে।

অগ্নিঝড় থেকে বের হওয়া কার্বনডাইঅক্সাইড মেট্রোর পাতালপথে নেমে আসে। যারা ট্রেনে বসে ছিল, তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়। বেসমেন্ট আর মাটির নিচে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, তারা বমি করতে শুরু করে, খিঁচুনি ওঠে, কোমায় চলে যায়, আর শেষমেশ মারা যায়।

মাটির ওপরে যারা সরাসরি এই বিস্ফোরণের দিকে তাকিয়েছিল, তারা অন্ধ হয়ে যায়। এই অন্ধত্বের ঘটনা তেরো মাইল দূর পর্যন্তও ঘটে।

গ্রাউন্ড জিরো থেকে সাড়ে সাত মাইল দূরে পেন্টাগনের চারপাশে ১৫ মাইলের একটা রিং বা বলয়ের মতো এলাকায়, যাকে ৫ পিএসআই জোন বলা হয়, সেখানে গাড়ি আর বাসগুলোর একে অপরের সাথে ধাক্কা লাগে। প্রচণ্ড তাপে পিচঢালা রাস্তা গলে যায়। বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো তরল লাভার মতো গলে যাওয়া রাস্তায় আটকে পড়ে।

হারিকেনের মতো ঝড়ো বাতাস শত শত আগুনকে হাজার হাজার, আর হাজার হাজার আগুনকে লাখ লাখ আগুনে রূপ দেয়। দশ মাইল দূরে উড়ে আসা গরম ছাই আর জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ নতুন নতুন আগুনের জন্ম দেয়। এই আগুনগুলো একের পর এক মিলে গিয়ে পুরো ওয়াশিংটন ডিসিকে একটা বিশাল অগ্নিঝড়ে পরিণত করে। এক মেগা-ইনফার্নো। আর খুব শিগগিরই এটা পরিণত হতে চলেছে আগুনের এক মেসোসাইক্লোনে।

আট, হয়তো বা নয় মিনিট পার হয়ে গেছে।

গ্রাউন্ড জিরো থেকে দশ আর বারো মাইল দূরে, অর্থাৎ ১ পিএসআই জোনে, বেঁচে যাওয়া মানুষেরা অনেকটা জম্বির মতো ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে থাকে। তারা বুঝতে পারছে না আসলে কী ঘটে গেল। তাদের একটাই চিন্তা, কীভাবে বাঁচবে। সেখানে হাজার হাজার মানুষের ফুসফুস ফেটে গেছে। মাথার ওপর উড়ে যাওয়া কাক, চড়ুই আর পায়রাগুলো আগুনে পুড়ে আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে। বিদ্যুৎ নেই, ফোনের নেটওয়ার্ক নেই, ৯১১-এর কোনো সাহায্য নেই।

বোমার এই লোকাল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পালস বা বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গ রেডিও, ইন্টারনেট আর টিভি সবকিছু নষ্ট করে দেয়। বিস্ফোরণের কয়েক মাইল দূরের বলয়ে ইলেকট্রিক ইগনিশন সিস্টেমের গাড়িগুলো আর স্টার্ট নেয় না। পানির পাম্পগুলো

কাজ করে না। পুরো এলাকাটা মারাত্মক বিকিরণে ভরে গেছে। ফলে যারা প্রথম উদ্ধার কাজে আসবেন, তাদের জন্যও এই এলাকাটা একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যারা কোনোভাবে বেঁচে গেছেন, তারা হয়তো কয়েক দিন পরেও বুঝতে পারবেন না যে তাদের সাহায্যের জন্য আসলে কেউ আসছে না।

প্রাথমিক বিস্ফোরণ, শকওয়েভ আর অগ্নিঝড় থেকে যারা কোনোমতে বেঁচে যান, তারা পারমাণবিক যুদ্ধ সম্পর্কে একটা ভয়ংকর সত্য বুঝতে পারেন। সেটা হলো, তারা এখন একদম একা। সাবেক ফেমা ডিরেক্টর ক্রেইগ ফুগেট বলেন, তাদের বাঁচার একটাই পথ, আর সেটা হলো নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নেওয়া। এখানেই শুরু হয় বেঁচে থাকার লড়াই, একটু খাবার, একটু পানি, একটু স্যালাইনের জন্য এক মরণপণ সংগ্রাম।

কিন্তু মার্কিন প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানীরা এই ভয়ংকর ব্যাপারগুলো এতটা নিখুঁতভাবে কীভাবে আর কেন জানেন? সাধারণ মানুষ যেখানে অন্ধকারে, সেখানে মার্কিন সরকার পারমাণবিক প্রভাব নিয়ে এতসব তথ্য কোথা থেকে পায়?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরও ঠিক প্রশ্নগুলোর মতোই বীভৎস। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে মার্কিন সরকার একটা সাধারণ পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসছে আর এর পরিকল্পনাগুলো নিয়ে মহড়া দিয়ে আসছে। একটা পারমাণবিক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যা অন্তত ২০০ কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবে।

এই প্রশ্নের আরও নির্দিষ্ট উত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ষাট বছরেরও বেশি সময় আগে। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে। ইউএস স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের সেই গোপন বৈঠকে।

প্রথম পর্ব

প্রস্তুতি পর্ব অথবা আমরা কীভাবে এই অবস্থায় এসে পৌঁছালাম

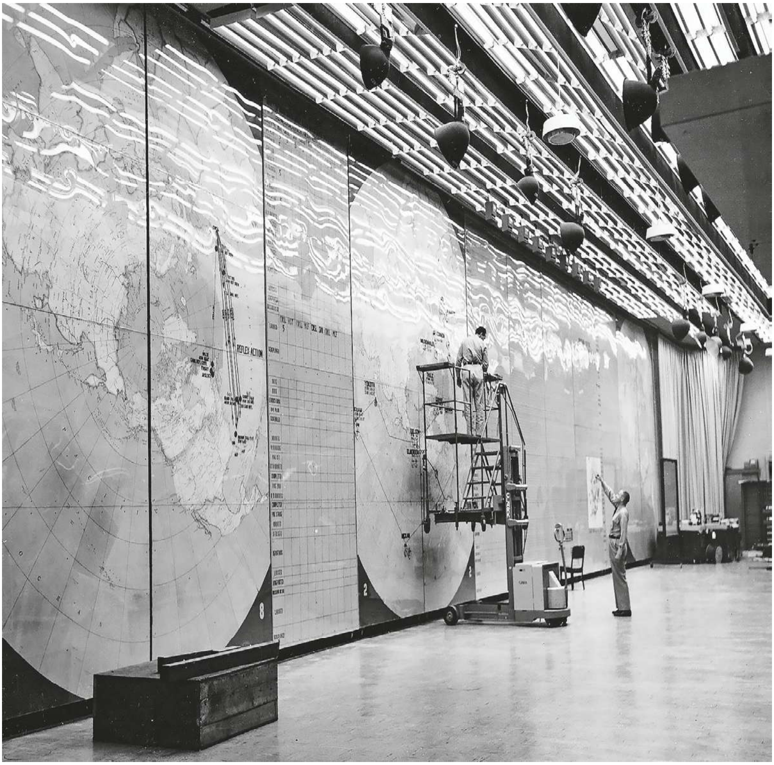

স্যাক সদর দফতর, মাটির নিচের কমান্ড পোস্ট। বিগ বোর্ড। ১৯৫৭ সালের শুরুর দিকের দৃশ্য। ইউএস এয়ার ফোর্স হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ এজেন্সি।

প্রথম অধ্যায়

(সাধারণ পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য টপ সিক্রেট পরিকল্পনা)

ডিসেম্বর ১৯৬০, স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড হেডকোয়ার্টার্স, অফুট এয়ারফোর্স বেস, নেব্রাস্কা

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। একদিন আমেরিকান সামরিক বাহিনীর একদল শীর্ষ কর্মকর্তা মিলে একটা গোপন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই পরিকল্পনার ফলে তখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ৩০০ কোটি মানুষের এক-পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ ৬০ কোটি মানুষ মারা যেত।

সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন :

টমাস এস গেটস জুনিয়র : মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

জেমস এইচ ডগলাস জুনিয়র : মার্কিন উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী।

জন এইচ রুবেল : মার্কিন প্রতিরক্ষা গবেষণা ও প্রকৌশল বিভাগের উপপরিচালক।

জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ।

জেনারেল টমাস এস পাওয়ার : ইউএস স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের কমান্ডার।

জেনারেল জর্জ এইচ ডেকার : সেনাপ্রধান।

অ্যাডমিরাল আর্লেগ এ বার্ক : নৌপ্রধান।

জেনারেল টমাস ডি হোয়াইট : বিমানবাহিনী কমান্ডার।

জেনারেল ডেভিড এম শৌপ : মেরিন কর্পস কমান্ড্যান্ট।

এছাড়া আরও অনেক শীর্ষস্থানীয় মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা।

বৈঠকটি হচ্ছিল মাটির নিচে একটা ঘরে। দেয়ালগুলো ছিল ১৫০ ফুটের বেশি লম্বা, আর কয়েক তলার সমান উঁচু। দোতলায় ছিল কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ঝুলন্ত বারান্দা। সারি সারি ডেস্ক, টেলিফোন আর ম্যাপের পর ম্যাপ। একটা পুরো দেয়াল জুড়েই ছিল শুধু ম্যাপ।

নেব্রাস্কার ওমাহার এই স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড সদর দপ্তর থেকেই জেনারেল আর অ্যাডমিরালরা পারমাণবিক যুদ্ধের সময় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন বলে ঠিক করা হয়েছিল। তখনকার দিনের জন্য এটা যেমন সত্যি ছিল, তেমনি ২০২৪ সালের আজকের দিনেও এটা সত্যি। এখন অবশ্য এই আন্ডারগ্রাউন্ড কমান্ড সেন্টারটাকে একবিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুদ্ধের উপযোগী করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এই মিটিং সম্পর্কে এখন আপনারা যা কিছু জানবেন, তার সবই আমরা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি ওই দিন সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী থেকে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা হয়েছিলেন। নাম জন এইচ রুবেল।

২০০৮ সালে, তার বয়স যখন আশির কোঠায়, মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি এই তথ্যগুলো একটা ছোট আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেন। রুবেল যখন তার নিজের মৃত্যুর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘকাল ধরে চেপে রাখা এক সত্য প্রকাশের সাহস পান। তিনি লিখেছিলেন যে, এমন এক হৃদয়হীন পরিকল্পনায় অংশ নেওয়ার জন্য তিনি অনুতপ্ত। এতগুলো বছর ধরে চুপ থাকার জন্যও তিনি অনুতপ্ত। তিনি যে পরিকল্পনার অংশ ছিলেন, তা মূলত এক গণবিধ্বংসী পরিকল্পনা ছিল। এটা তার নিজের কথা।

সেই দিন নেব্রাস্কার বিশাল ওই মাটির তলার বাঙ্কারে, রুবেল তার সহযোগী পারমাণবিক যুদ্ধ পরিকল্পনাকারীদের সাথে বসেছিলেন। সারি সারি ফোল্ডিং চেয়ারে, যেগুলোর কাঠের পাটাতন ছিল। চার-তারকা জেনারেলরা সামনের সারিতে আর এক-তারকা জেনারেলরা পেছনের সারিতে বসেছিলেন। রুবেল, যিনি তখন মার্কিন প্রতিরক্ষা গবেষণা ও প্রকৌশল বিভাগের উপপরিচালক, বসেছিলেন দ্বিতীয় সারিতে।

স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল টমাস এস পাওয়ারের সংকেতে...

জেনারেল পাওয়ারের ইশারায় একজন ব্রিফার মঞ্চে এগিয়ে এলেন। তারপর একজন সহকারী একটা ইজেল নিয়ে হাজির হলেন, আর আরেকজন একটা পয়েন্টার লাঠি হাতে নিলেন। প্রথমজনের কাজ ছিল চার্ট ওল্টানো, আর দ্বিতীয়জনের কাজ ছিল

চার্টের বিভিন্ন জিনিস পয়েন্ট করে দেখানো। জেনারেল পাওয়ার তার শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলছিলেন যে, কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর একটা সর্বাত্মক পারমাণবিক হামলা চালানো হবে।

দুজন বৈমানিক এগিয়ে এসে ১৫০ ফুট লম্বা ম্যাপের দেয়ালে দুপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুজনের হাতেই একটা লম্বা মই। ম্যাপে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর চীনকে দেখানো হয়েছিল, যাকে তখন সিনো-সোভিয়েত ব্লক বলা হতো। আর এর আশেপাশের দেশগুলোকেও দেখানো হয়েছিল।

রুবেল পরে স্মরণ করে লিখেছিলেন, 'দুজনেই একই গতিতে নিজেদের লম্বা মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন, আর ঠিক একই সময়ে চূড়ায় পৌঁছালেন। তারা ওপরে উঠে একটা লাল ফিতার দিকে হাত বাড়ালেন। আমরা খেয়াল করলাম, ফিতাটা একটা বড় পরিষ্কার প্লাস্টিকের রোলকে আটকে রেখেছে। তারা দুজনেই একসাথে ফিতার বাঁধনটা খুলে দিলেন। আর সাথে সাথেই হুশ করে প্লাস্টিকের সিটটা খুলে নিচে ঝুলে পড়ল, একটু হাওয়ায় উড়ল, তারপর ম্যাপের সামনে ঢিলেঢালাভাবে স্থির হয়ে রইল।'

ম্যাপে শত শত ছোট কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল। বেশিরভাগ দাগই ছিল মস্কোর ওপরে। প্রত্যেকটা দাগ দিয়ে এক একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণকে বোঝানো হচ্ছিল।

জেনারেল পাওয়ারের ব্রিফারদের একজন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর মার্কিন পারমাণবিক হামলার পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি জানালেন, প্রথম দফার হামলাটা হবে মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো দিয়ে, যেগুলো জাপানের ওকিনাওয়াতে থাকা বিমানবাহী রণতরীগুলো থেকে উড়ানো শুরু করবে। এরপর একের পর এক হামলার ঢেউ আসতে থাকবে।

এরপর বোয়িং বি-৫২ দূরপাল্লার কৌশলগত বোমারু বিমানগুলো একের পর এক বোমা ফেলতে শুরু করবে। প্রত্যেকটা বিমানের বোমা রাখার জায়গায় একাধিক থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকবে। এই অস্ত্রগুলো জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে ফেলা পারমাণবিক বোমার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারবে।

রুবেল লিখেছেন, যখনই ব্রিফার নতুন কোনো হামলার কথা বলছিলেন, মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ওই দুজন মানুষ নতুন একটা লাল ফিতা খুলে দিচ্ছিলেন। আর হুশ করে আরেকটা প্লাস্টিকের সিট নিচে নেমে আসছিল। মস্কো আরও বেশি করে

ওই কালো দাগগুলোর নিচে ঢেকে যাচ্ছিল।

রুবেল আরও লিখেছেন, যে বিষয়টা তাকে সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছিল তা হলো, শুধু মস্কো শহরটা ধ্বংস করার জন্যই নাকি ৪০ মেগাটন পারমাণবিক বোমার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। মেগাটন! এটা হিরোশিমায় ফেলা বোমার চেয়ে প্রায় চার হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চার বছরেরও বেশি সময়ে দুই রণক্ষেত্রেই মিত্রবাহিনী যে পরিমাণ সাধারণ বোমা ফেলেছিল, তার চেয়েও হয়তো বিশ থেকে ত্রিশ গুণ বেশি!

অথচ ১৯৬০ সালের এই গোটা মিটিংয়ে রুবেল নিজের চেয়ারে বসে রইলেন, আর একটা কথাও বললেন না।

একটা শব্দও না। দীর্ঘ আটচল্লিশ বছর ধরে তিনি চুপ করে ছিলেন। তবে তার এই স্বীকারোক্তিটা সত্যিই অনেক বড় একটা ব্যাপার। এই প্রথম ওই মিটিংয়ে থাকা কেউ একজন সাহস করে এতটা বিস্তারিত জানালেন যে সেদিন ওখানে ঠিক কী ঘটেছিল। এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে, এই ঘরের বাইরের যেকোনো মানুষের কাছেই এটা পরিষ্কার যে, পারমাণবিক যুদ্ধের এই পরিকল্পনাটা আসলে একটা গণহত্যা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বিমানবাহিনীর লোকেরা মই বেয়ে নিচে নামলেন, মইগুলো ভাঁজ করলেন, বগলে চেপে ধরে চোখের আড়াল হয়ে গেলেন।

হিরোশিমায় ফেলা বোমার চেয়ে চার হাজার গুণ বেশি বিস্ফোরক ক্ষমতা!

এর মানে কী দাঁড়ায়? মানুষের মস্তিষ্ক কি আদৌ এই ব্যাপারটার বিশালতা পুরোপুরি কল্পনা করতে পারবে?

সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হলো, এই গণবিধ্বংসী পরিকল্পনাটা কি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই কেউ থামাতে পারবে?

◈ ◈ ◈

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধ্বংসস্তূপের মাঝে এক কিশোরী ৬ আগস্ট, ১৯৪৫, হিরোশিমা, জাপান

১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে হিরোশিমার বুকে যে পারমাণবিক বোমাটা ফেলা হয়েছিল, তা মাত্র একটা আঘাতেই ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। এই মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা নিয়ে অবশ্য এখনও তর্ক-বিতর্ক আছে। বোমা পড়ার পরের দিনগুলোতে বা সপ্তাহগুলোতে নিহতদের ঠিকঠাক হিসাব করার কোনো উপায় ছিল না। হিরোশিমার সরকারি ভবন, হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন আর দমকল কেন্দ্রগুলোর সব একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তখন এক চরম বিশৃঙ্খলা আর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল।

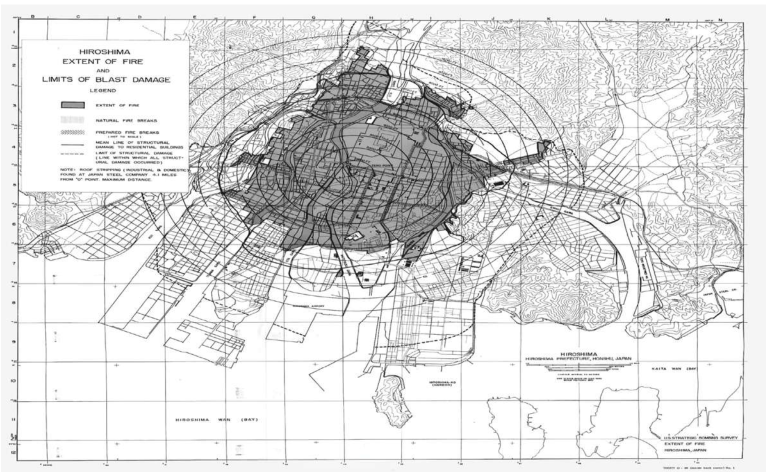

হিরোশিমায় আগুন আর বিস্ফোরণের কারণে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল, তার একটা ম্যাপ তৈরি করেছিল মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক বোম্বিং সার্ভে। এই ম্যাপটা মার্কিন ন্যাশনাল আর্কাইভসে সংরক্ষিত আছে।

তেরো বছরের কিশোরী সেতসুকো থার্লো এই বোমা ফাটার কেন্দ্র বা গ্রাউন্ড জিরো থেকে মাত্র ১.১ মাইল দূরে ছিল। লিটল বয় নামের এই পারমাণবিক বোমাটা হিরোশিমার ওপর প্রায় ১৯০০ ফুট উঁচুতে বিস্ফোরিত হয়েছিল। এটাকেই মূলত এয়ারবার্স্ট বা আকাশে বিস্ফোরণ বলা হয়। যুদ্ধের ময়দানে এটাই ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের প্রথম ব্যবহার।

বোমাটা ঠিক কতটা উঁচুতে ফাটলে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যাবে, এই হিসাবটা নিখুঁতভাবে করেছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী জন ভন নিউম্যান। তার কাজই ছিল এই একটাই পারমাণবিক বোমা দিয়ে মাটিতে থাকা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ মারার উপায় বের করা। কারণ, মাটির একদম কাছাকাছি কোনো পারমাণবিক বোমা ফাটালে তার শক্তির অনেকটা অপচয় হয় আর প্রচুর মাটি এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে। সামরিক পরিকল্পনাকারীরা এই ব্যাপারটা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন আর এর সাথে একমতও হয়েছিলেন।

এই বিস্ফোরণের ধাক্কায় সেতসুকো জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফেরার পর সেতসুকো দেখল, সে কিছু দেখতেও পারছে না, নড়াচড়াও করতে পারছে না। বছর কয়েক পরে সেতসুকো সেই দিনটার কথা মনে করে বলেছিল, 'আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার আশেপাশের মেয়েরা ফিসফিস করে কথা বলছে। তারা বলছিল, 'ঈশ্বর, আমাকে বাঁচাও। মা, আমাকে বাঁচাও। আমি এখানে।'

একটা ভেঙে পড়া দালানের নিচে চাপা পড়েছিল সেতসুকো। কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিল পারমাণবিক বোমার প্রথম ধাক্কা থেকে। সেতসুকো শুধু মনে করতে পারছিল, ওর চারপাশে সব ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। ওর প্রথম মনে হয়েছিল যে ও বোধহয় ধোঁয়ায় পরিণত হয়েছে। কিছুক্ষণ পর, হয়তো কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট পর, ওর কানে একটা অচেনা পুরুষ মানুষের গলা ভেসে এল, যে ওকে কিছু একটা করার নির্দেশ দিচ্ছিল।

লোকটি বলল, 'হাল ছেড়ো না। আমি তোমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি।'

ওই অচেনা লোকটা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আর ওর বাঁ কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে ওকে বের করার চেষ্টা করছিল। সেতসুকো মনে মনে ভাবছিল, 'বেরোও... যত তাড়াতাড়ি পারো হামাগুড়ি দিয়ে বেরোও।'